আর এক দল রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানী ও বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এঁদের অনুযায়ী জাতিপ্রথার ইতিবাচক অবদান অনস্বীকার্য। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন জাতির মানুষজন তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে। সকল রাজনৈতিক দল এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের রাজনীতিক সমর্থন অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগী হয়। তার ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষের সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয়। আবার ভারতের রাজনীতির ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথাকে একমাত্র বিভেদমূলক শক্তি হিসাবে অভিযুক্ত করা অনুচিত। জাতিব্যবস্থা সংহতিসূচক শক্তি হিসাবেও ভূমিকা পালন করতে পারে। ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে ভারতের মানুষ বিভিন্ন জাতি নির্বিশেষে কংগ্রেস দলকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছিল। রজনী কোঠারীর অভিমত অনুযায়ী বিবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতিপ্রথার সদর্থক দিকটি অবহেলার নয়। রুডলফ্‌স (Rudolphs) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "(Caste in Politics) has been seriously misunderstood and its positive contribution neglected."

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় জাতিপ্রথার মূল ইতিহাসের গভীরে প্রথিত। ভারত হল জনবহুল এক বিশাল দেশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের শেষ নেই। জাতিপ্রথাই এ ক্ষেত্রে সামাজিক গোষ্ঠীবিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সনাতন ভারতের ঐতিহ্যগত বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবলোপ অভিপ্রেত নয় এবং বাস্তবে সম্ভবপরও নয় । ভি. কে. আর. ভি. রাও (Dr. V. K. R. V. Rao) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি এও বলেছেন যে, আধুনিক ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতির ভূমিকাকে সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিগত বিচার-বিবেচনার অনুপ্রবেশ আটকান আবশ্যক। ক্ষমতার রাজনীতি, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির স্বার্থে সংকীর্ণমনা ও ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের জাতিপ্রথাকে সহজলভ্য ও ফলপ্রদ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়। রাজনীতিকদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রতিরোধ করা দরকার। আবার এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, জাতিগোষ্ঠীসমূহের রাজনীতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমকালীন সামাজিক সত্যের অভিব্যক্তি ঘটে। তেমনি জাতি-গোষ্ঠীগুলি নিজেদের অবস্থার সামগ্রিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে রাজনীতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণের অমোঘ প্রভাবে ভারতের সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক ভারতের উন্নয়নশীল ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে জাতিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং পারেনি। বর্তমানে কেবলমাত্র জাতিগোষ্ঠীর সমর্থনকে মূলধন করে রাজনীতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে টিকে থাকা বা সফল হওয়া যায় না। দেশের সকল রাজনীতিক দলই এই সাধারণ সত্য সম্পর্কে সজাগ। এই কারণে বর্তমানে ভারতের রাজনীতিক দলগুলিকে জনকল্যাণমূলক দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে জনসাধারণের কাছে সমর্থনের জন্য আবেদন করতে দেখা যায়। এ রকম পরিবর্তিত রাজনীতিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ভারতের বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থে রাজনীতিকে ব্যবহার করেছে, নাকি রাজনীতির স্বার্থে জাতিগোষ্ঠীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে — এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

২৭.৬ আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহ এবং ভারতীয় রাজনীতি (Tribal and Other Backward Peoples and Indian P

বহু ও বিভিন্ন আদিবাসী

বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে গোষ্ঠী-চেতনার ... এদের কাছে জাতিই হল ... সামাজিক গোষ্ঠী। এদের কাছে অন্য কোন বৃহত্তর গোষ্ঠীর চেতনা আশা করা অর্থহীন। ... সমস্ত মানবগোষ্ঠী জাতিগত ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আনুগত্যের বিষয়টি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে বলা হয় যে জাতিপ্রথা হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি ... প্রথম পদক্ষেপ। তবে দীর্ঘকালীন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি ... জাতিভেদ ব্যবস্থার অবসানের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

জাতিপ্রথার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতপার্থক্য ।। ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতিপ্রথার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রসঙ্গে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌দের অভিমত অনুসারে তিন-চার দশক আগে জাতিব্যবস্থা ছিল একটি প্রাধান্যকারী সামাজিক শক্তি। বর্তমানে জাতিব্যবস্থা বহুলাংশে হীনবল হয়ে পড়েছে। ব্যাপক শিল্পায়ন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিস্তার, যোগাযোগ ও সংযোগের ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার জাতিগত বিচার-বিবেচনাকে দুর্বল করে দিয়েছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিব্যবস্থা থেকে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন প্রতিপন্ন হচ্ছে। মানবজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাবাদী ধ্যান-ধারণা এবং সাধারণ সচেতনতা ক্রমান্বয়ে জাতিগত আনুগত্যকে অনেকাংশে অর্থহীন করে দিয়েছে। কিন্তু বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীনিবাস এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর *Social Change in Modern India* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, সাক্ষরতা ও শিক্ষার বিস্তার, সামগ্রিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি জাতিব্যবস্থাকে হীনবল করার পরিবর্তে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশের অভিমত অনুসারে ভারতের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে জাতি হল সংহতির সহায়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। অন্যান্যদের মতানুসারে জাতিভেদ প্রথা হল সামাজিক সংহতি ও আর্থনীতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বিশিষ্ট দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন (D. Radhakrishnan) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "The occupational rationality of the caste system has gradually lost its earlier validity. Caste has ceased to be a social evil, but has become a political and administrative evil."

পল ব্রাসের অভিমত ।। পল ব্রাস (Paul Brass)-এর অভিমত অনুযায়ী ১৯৬৭ সাল অবধি কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী রাজনীতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক রাজনীতিক বিরোধিতার ক্ষেত্রে জাতিগত বিবাদ-বিসংবাদ বা জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তেমন বড় ধরনের কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়া ছিল না। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জাতিগত বিচার-বিবেচনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত ভারতের গ্রামাঞ্চলের দিকে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জাতিগত বিচার-বিবেচনা সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব-প্রতিপত্তি কায়েম করে। ব্রাস বলেছেন: "Success in elections in rural constituencies depends primarily upon the ability to establish a base in one of the locally dominant land-controlling castes and then combining that support with an effective approach to one or more other important local castes groups or a low caste group or the local Muslim minority." তবে ব্রাস মনে করে যে, ভারতের জাতিগত স্তরের রাজনীতিতে জাতিগত বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ কেন্দ্রীয় রাজনীতির উপর জাতিব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সিদ্ধান্তমূলক নয়, সমালোচক কিন্তু ফ্রান্‌কেল (Francine Frankel) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর অভিমত অনুসারে বিহারের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতি বিশেষত পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের কর্তৃত্বমূলক প্রভাব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। জাতি ও জনসম্প্রদায়গত ... সকল জনগোষ্ঠী ...

ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে জোট বন্ধন ভারতে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে। ফ্রান্‌কেলের মতানুসারে, এই কারণে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ প্রতিবেশী দুই রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের নির্বাচনী রাজনীতির চেহরা-চরিত্র স্বতন্ত্র।

জাতিগত প্রাধান্য আঞ্চলিক ।। তবে সাধারণভাবে একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা জনসম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠী রাজনীতিক শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলছে। কোন কোন অঙ্গরাজ্যে সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতার জন্য কতকগুলি জাতিকে নিরন্তর সংগ্রামের সামিল হতে দেখা যায়। এবং এ ধরনের সংগ্রামে সচেতনতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কতকগুলি অঙ্গরাজ্যে জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচনী রাজনীতি পরিচালিত হয়। এবং এই সমস্ত রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারও সমর্থনকারী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সন্তুষ্টির স্বার্থে সরকারী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। এই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বা জাতি-দাঙ্গা প্রায়শই সংঘটিত হতে দেখা যায়। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতিগত বিচার-বিবেচনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু দেশের সকল অঞ্চলের সকল নির্বাচনকে সবসময় জাতিগত আনুগত্য বা জাতিগত জোটবন্ধন একক ভাবে প্রভাবিত করতে পারে না।

২৭.৫ মূল্যায়ন (Evaluation)

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতপাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গভীর ও বিশেষভাবে ব্যাপক। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়; সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়। এই সমস্ত সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থার সুবাদে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব-প্রতিপত্তির সূত্রপাত, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনই হল বড় কথা। ভারতের নীচু জাতির জনগোষ্ঠীগুলির সংখ্যাধিক্যের রাজনীতিক গুরুত্ব দেশের সকল রাজনীতিক দলই অনুধাবন ও উপলব্ধি করেছে। এই কারণে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ সকল রাজনীতিক দলই এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে সাধ্যমত উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ-আয়োজন অপরিহার্য। এ বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন অতিমাত্রায় সতর্ক ও উদ্যোগী। সামাজিক স্তরবিন্যাসে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত এই সমস্ত নীচু জাতির মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রকারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এবং স্বাভাবিকভাবে তিনি এই অবহেলিত ও অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীগুলির অকুণ্ঠ রাজনীতিক সমর্থন পেয়েছিলেন।

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতপাতের ভূমিকার ফলাফল সম্পর্কে মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। এ বিষয়ে চিন্তাবিদ্‌রা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত। এক দলের মতানুসারে জাতিপ্রথার ভূমিকা নেতিবাচক, আর একদলের মতানুযায়ী ইতিবাচক।

রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জাতি ব্যবস্থার ভূমিকা বিভেদমূলক। জাতিগত বিচার-বিবেচনার কারণে গোষ্ঠীগত আনুগত্যের সৃষ্টি হয় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা প্রশ্রয় পায়। নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতার পরিবর্তে জাতিগত বিচার-বিবেচনাই প্রাধান্য পায়। তার ফলে যোগ্যতর প্রার্থী পরাজিত হওয়ার এবং অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে দেশ ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া দেশ ও জাতি বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। স্বভাবতই ভারতীয় রাজনীতির এই বৈশিষ্ট্য অশুভ ও অস্বাস্থ্যকর। এর ফলাফল ভাল হতে পারে না।

অবস্থান নির্বিশেষে নীচু জাতির মানুষজনও দলীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা
উদ্যোগী হয়। রাজনীতিক দলের কাছে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে
মনোনীত প্রার্থী হিসাবে টিকিট দাবি করে। মরিস-জোন্স (W.H.Morris-Jones)
Government and Politics of India শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে
করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী বর্তমান ভারতে জাতিসমূহের কাছে রাজনীতি
গুরুত্বপূর্ণ, অনুরূপভাবে রাজনীতিতেও জাতির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
মন্তব্য করেছেন: ''.....that politics is more important to castes and
more important to politics than before.'' জাতীয় স্তরের নেতারা নীতিগতভাবে
সমাজব্যবস্থার কথা বলতে পারেন; কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়
সাম্প্রতিককালে গ্রামাঞ্চলে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নির্বাচকমণ্ডলী জাত-পাতের সেই সাবেকি
ধারার অনুগামী। এ বিষয়ে মরিস-জোন্স বলেছেন : ''....the newly enfranchised
masses know only the language of traditional politics which so largely
about caste....Behind the formal list of party candidates nominated for
tests, there is probably a inside story of careful calculation in terms of
appeal.''

ভারতের রাজনীতিক দলসমূহের জাতিগত সমর্থনের ভিত্তি // ভারতে পিছড়ে বর্ণ
ও তপসিলী জাতিসমূহের স্বতন্ত্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হিসাবে বিশেষ কিছু
দলের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। কাঁসিরামের বহুজন সমাজ পার্টি দলিতদের স্বার্থের প্রতিনি
হিসাবে বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। তবে
উত্তরপ্রদেশেই বহুজন সমাজ পার্টির রাজনীতিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। উত্তরপ্রদেশের বি
ছাড়াও লোকসভায় এই দলের বেশ কিছু সদস্য আছে। অনুরূপ আকৃতি-প্রকৃতির অ
রাজনীতিক দল হল আগেকার ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টি। তবে এই দলটির রা
গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এই দুটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনগ্রসর কিন্তু জমিজমার মালি
ক্ষমতাশালী জাতিসমূহের স্বার্থ রক্ষাকারী দল হিসাবে জনতাদল ও সমাজবাদী-পার্টি
বলা হয়। বিহার ও কর্ণাটকে জনতাদলের রাজনীতিক শক্তি-সামার্থ্য অনস্বীকার্য। তবে ভ
ভেঙ্গে এই দলের প্রাক্তন সভাপতি এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের নেতৃ
রাষ্ট্রীয় জনতাদল গঠিত হওয়ায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। বিহারের যাদব ও অ
পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে রাষ্ট্রীয় জনতাদলও ইতিমধ্যে সাড়া জা
সমাজবাদী পার্টির রাজনীতিক কার্যকলাপ মূলত উত্তরপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ। তবে সং
রাজনীতিতে মুলায়ম সিং যাদবের নেতৃত্বাধীন এই রাজনীতিক দলটির গুরুত্ব ও
অনস্বীকার্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বর্তমান ভারতের
দুটি সর্বভারতীয় দল সাধারণত সম্পত্তিবান ও উন্নত জাতিসমূহের স্বার্থ রক্ষাকারী রা
দল হিসাবে পরিচিত। মরিস-জোনস (Morris-Jones)-এর মতানুসারে ১৯৭১ সালের
নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে বিভিন্ন তপসিলী জাতি ও
অবহেলিত জাতিসমূহের নির্বাচনী সমর্থনের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু জরুরী অবস্থা
অনুষ্ঠিত ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তপসিলী জাতিসমূহ এবং অন্যান্য অনগ্রসর জা
কংগ্রেস দলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মাইরন-ওয়েনার (Myron-Weiner)-এর
অনুযায়ী তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিসমূহ পুনরায় ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের
সমর্থন যোগায়। বস্তুত ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
সমর্থন বা বিরোধিতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

জাতিগোষ্ঠীর রাজনীতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তর — জাতিগত সংগঠনসমূহ রাজনীতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের সহায়ক // রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পর জাতিগোষ্ঠী একটি রাজনীতিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর সত্ত্বেও জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে। তবে রাজনীতিক গোষ্ঠী হিসাবে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা হ্রাস পায়। ভারতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতার সম্পর্ক দেশের এখানে-ওখানে এখনও দেখা যায়। জাতিগত শত্রুতা সূত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবিধ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সামিল হওয়ার পর জাতিগোষ্ঠীগুলি নতুন করে তাদের সাবেকী উপগোষ্ঠীগত শক্তি-সামর্থ্যকে সুসংহত করেছে। জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এই প্রবণতা আঞ্চলিকতাবাদের অনুপন্থী এবং জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। এতদসত্ত্বেও বর্তমান ভারতের জাতিভিত্তিক সংগঠনসমূহের সদর্থক ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে কোচানেক্ (Stanley A. Kochanek) তাঁর *The Indian Political System* শীর্ষক রচনায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আধুনিক ভারতের জাতিগত সংগঠনসমূহ মধ্যবর্তী ও নীচু জাতির মানুষকে আত্মমর্যাদার একটি ভিত্তি অর্জনে সাহায্য করেছে। এইভাবে তথাকথিত নীচু জাতির মানুষও সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে। তার ফলে সমাজে জাতিগত স্তরবিন্যাসের সনাতন আচার-বিচারের বৈষম্য বহুলাংশে অপসৃত হয়েছে এবং এক ধরনের সামাজিক সাম্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ জাতিগত সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বর্তমান ভারতের জাতিগত সংগঠনসমূহ রাজনীতিক সংযোগসাধন ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে এবং রাজনীতিক নেতৃত্বের সমস্যার সম্যক সমাধান করেছে। জাতিগত সংগঠনগুলি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জনসাধারণকে সংযুক্ত করেছে। তার ফলে রাজনীতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জাতিগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক দলে পরিণত হয়েছে // ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতিপ্রথার ভূমিকাটি বিশেষভাবে বিতর্কিত। তবে জাতিব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী। এ বিষয়ে কোন রকম বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক দলসমূহের উপর জাতিপ্রথার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি মার্কসবাদী রাজনীতিক দলগুলিও এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তবে ভারতের সংকীর্ণতামুক্ত উদারনীতিক রাজনীতিক নেতারা জাতিভেদ প্রথা এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদের বিপদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন। তাই তাঁরা এর আশু অবসানের পক্ষপাতী। এতদসত্ত্বেও এই সমস্ত বিচক্ষণ রাজনীতিকরাও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাক্কালে সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য ভোট সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে জাতিপ্রথার শক্তি-সামর্থ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এ রকম দায়িত্বশীল রাজনীতিকরা তখন কার্যত উভয় সংকটের সম্মুখীন হন। কিন্তু সাধারণ রাজনীতিকরা নির্বাচনী সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য জাতিপ্রথার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে অতি উৎসাহের সঙ্গে নৈতিক-অনৈতিক যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। এই কারণে একসময় জয়প্রকাশ নারায়ণ মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতে জাতিগোষ্ঠী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক দলে পরিণত হয়েছে।

জাতিপ্রথার-প্রভাব-প্রতিক্রিয়া — জাতিপ্রথার সংহতিসূচক শক্তি // জাতিপ্রথার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। জাতিভেদ ব্যবস্থার বিভেদমূলক শক্তিকে অবহেলা করা যায় না। আবার ধর্মনিরপেক্ষতার পথে জাতিপ্রথা হল একটি বড় বাধা, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও জাতিব্যবস্থার সংহতিসাধনমূলক শক্তির গুরুত্বও অনস্বীকার্য। জাতিগত চেতনার ভিত্তিতে ব্যক্তিবর্গ একটি গোষ্ঠী হিসাবে সুসংহত। অর্থাৎ জাতিগত ধারণা মানুষকে ঐক্যসূত্রে একত্রিত করে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সামাজিক দুনিয়াটি নিতান্তই অল্প পরিসরের। এর পরিধি পনের-কুড়ি মাইলের বেশী নয়। গ্রামাঞ্চলের এই সমস্ত দরিদ্র মানবগোষ্ঠী জাতিগত

কংগ্রেস মাহারদের রাজনীতিক সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় এবং সফল হয়।
অন্ধ্রের রাজনীতিতে কংগ্রেস তার রাজনীতিক সমর্থনের শক্ত ভিত্ গড়ে তুলতে সক্ষ
মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণরা সংখ্যায় কম। কিন্তু তাদের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষার আধিক্য উল্লে
এই সুবাদে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়।

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে জাতি // ভারতের অন্যান্য রাজনীতিক দলও জাতিগত
প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করতে পারে না। বস্তুত জাতিব্যবস্থা ভারতের অন্যান্য রাজ
দলকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে জাতিগত বিচার-বি
ভিত্তিতে রাজ্যের রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষি
তামিলনাড়ুর পরস্পর-বিরোধী প্রধান দুটি রাজনীতিক দল হল ডি. এম. কে. (D. M. K.
এ. আই. এ. ডি. এম. কে (AIADMK) । এই দুটি দলই ব্রাহ্মণ-বিরোধী। এবং এই দুটি
দলের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষিও প্রবল। রাজ্যের পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহের সমর্থন
উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ুর রাজনীতিক দলগুলি অনগ্রসর জাতিসমূহের অনুকূলে সংরক্ষ
সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এমনকি এ ক্ষেত্রে রাজ্যের রাজ
দলসমূহের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও পরিলক্ষিত হয়। তেলেগু দেশম সরকার
সালে পশ্চাদ্‌পদ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষণের কোটাকে পঁচিশ শতাংশ থেকে
করে চুয়াল্লিশ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে
করা হয়। দেশম্ সরকারের সংরক্ষণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে আদালত অসাংবিধানিকতার
বাতিল করে দেয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহ ব্যাপক ও হিংসাত্মক আন্দোল
সামিল হয়।

কেরলের রাজনীতিতে জাতি // কেরলে ইজহাভাস হল একটি তথাকথিত নিম্ন
জাতি। সরকারের সংরক্ষণনীতির মূল ও অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধা এরাই ভোগ করে। কে
নির্বাচনী রাজনীতিতে এই জাতিগোষ্ঠীটি কমিউনিস্ট দলকে সমর্থন করে। বিপরীতক্রমে কো
নায়ার ও খ্রিস্টানরা কমিউনিস্ট দলের বিরোধিতা করে। আবার অতীতে কেরলের ন
সারভিস সোসাইটি প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিকে তাদের রাজনীতিক হাতিয়ার হিসাবে ব
করত।

কর্ণাটকের রাজনীতিতে জাতি // দেবরাজ আর্স-এর আমলে কর্ণাটকে কংগ্রেস স
অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য বিশেষ ছাড় ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পশ্চা
জাতিসমূহের মধ্যে নিজের সমর্থনের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ১৯
সালের নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের ভিতর থেকে অধিক সংখ্যায় দলীয় প্রার্থী মনো
করে। কংগ্রেস দল নির্বাচনী সাফল্যের ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন হয়। অতঃপর কংগ্রেস স
অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসাবে লিঙ্গায়েতদের স্বীকৃতিকে বাতিল করে দেয়। কারণ কর্ণাটকে
লিঙ্গায়েতরা ছিল অত্যন্ত অগ্রসরপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু ভক্কালিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানু
লিঙ্গায়েতদের মতই উন্নত। অথচ অনগ্রসর সম্প্রদায় হিসাবে ভক্কালিঙ্গদের স্বীকৃতিকে বা
করা হল না। জমিজমার মালিক প্রাধান্যকারী এই দুই জাতিগোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়। এবং
ফলে কর্ণাটকের রাজ্য-রাজনীতিতে পটপরিবর্তন ঘটে। ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বা
রামকৃষ্ণ হেগড়ের নেতৃত্বে জনতা দল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

নিকট অতীতে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের রাজ্য-রাজনীতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বি
জাতিগোষ্ঠীর জোটের দ্বারা অথবা বিভিন্ন জাতির বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে সম্পাদিত জো
দ্বারা। পল ব্রাস (Paul Brass)-এর অভিমত অনুযায়ী রাজ্য-রাজনীতিতে জাতিগত প্র
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে। এই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের
উল্লেখযোগ্য হল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থান।

রাজনীতিও জাতিপ্রথাকে প্রভাবিত করে // রাজনীতি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে বর্তমানে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে এক-একটি জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত সংহতির সঙ্গে সক্রিয় হয়। এবং প্রধানতঃ ভোটাধিকার ও পঞ্চায়েতীরাজকে তারা উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থা হল উন্মুক্ত এবং নমনীয় প্রকৃতির। তার ফলে রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিসমূহের প্রবেশের সুযোগ-সুবিধা অবারিত। এইভাবে বর্তমান ভারতে রাজনীতির উপর জাতিপ্রথার প্রভাব অনস্বীকার্য।

কিন্তু জাতি যেমন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাজনীতিও জাতিপ্রথাকে প্রভাবিত করে; রাজনীতি জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সংহতিকে দুর্বল করে দেয়। রাজনীতিক ক্ষমতা অর্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে জাতিগত সংহতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু বিপরীতক্রমে রাজনীতিক ক্ষমতা জাতিগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে। কারণ রাজনীতিক ক্ষমতা জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি করে। তার ফলে জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্নে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে জাতিগোষ্ঠীর ভিতরকার পরস্পর-বিরোধী উপগোষ্ঠী অন্য জাতিগোষ্ঠীর সাহায্য-সহযোগিতা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে উঠে এবং অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনীতিক আঁতাত করে। জাতিগত সংহতির বাঁধ তখন ভেঙ্গে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, অন্ধ্র-রাজনীতিতে রেড্ডী জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু অনেক সময় রেড্ডী গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন রেড্ডীদেরই উপগোষ্ঠীসমূহ অ-রেড্ডী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনীতিক আঁতাত করতে দ্বিধা করে না। তার ফলে রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতিগতবিন্যাসের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। তবে সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে সকল জাতিগোষ্ঠীকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। আবার আর্থনীতিক রাজনীতিক স্বার্থ সাধনের জন্য জাতিগোষ্ঠীসমূহ অনেক সময় জাতিগত ঐতিহ্যের ধারাকে উপেক্ষা বা অতিক্রম করে।

রজনী কোঠারী // সুতরাং, জাতি যেমন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাজনীতিও জাতিপ্রথাকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি জাতিপ্রথায় পরিবর্তন সূচীত করে। জাতির অভ্যন্তরীণ সংহতি ও জাতি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বাধঃ বিন্যাস রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলা হয় যে, জাতির রাজনীতিকরণ ঘটেছে। জাতির রাজনীতিকরণের এই পথটি এক মুখী নয়, উভয় মুখী। জাতি এবং রাজনীতি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে এবং করে। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার এই বিষয়টি রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। এ বিষয়ে রজনী কোঠারী তাঁর *Politics in India* শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: ''It is politics that gets caste - ridden. It is caste that gets politicised Dialectical as it might sound, it is precisely because the operation of competitive politics has drawn out of its political context and given it a new status and identity hitherto unknown, which had begun to disintegrate.''

মরিস-জোন্স // প্রত্যেক জাতিকেই নিজেকে অধিকতর আধুনিক করতে আগ্রহী ও উদ্যোগী দেখা যায়। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হওয়া এবং সাম্প্রতিককালের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। নির্বাচনী রাজনীতিতে উঁচু জাতিগোষ্ঠীগুলির মতই নীচু জাতিগোষ্ঠীগুলির মানুষও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসের বিষয়টি নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থহীন। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণের বা জাতির মানুষজন সম্যকভাবে অবহিত। স্বভাবতই সামাজিক স্তরবিন্যাসে মর্যাদাগত

ক্ষমতার অংশীদার হিসাবে ভাবতে শুরু করে। অতঃপর গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার
বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা গণভিত্তি লাভ করে। এলিট
থেকে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসে। রাজনীতিক তথা সরকারী ক্ষমতার জন্য
ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তথাকথিত
নীচু জাতির মানুষও নির্বাচনী রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল হয়। এইভাবে ভারতের
অঞ্চলের রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তাৎপর্যপূর্ণ

কংগ্রেস দলের পক্ষে জাতিগত সমর্থন // ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দল
জাতিগোষ্ঠীকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।
ভারতের কোন কোন জাতিগোষ্ঠী নির্দিষ্ট কোন কোন রাজনীতিক দলের প্রতি তাদের
সীমাবদ্ধ রাখে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে
করা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত
কেন্দ্রে এবং অঙ্গরাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দল ক্ষমতাসীন ছিল। সুতরাং বৈষয়িক সুযোগ
প্রদানের ক্ষমতা কংগ্রেস দলের হাতেই ছিল। স্বভাবতই তপসিলী জাতি ও উপ
সমেত সকল অনগ্রসর জাতি কংগ্রেসের 'ভোট ব্যাঙ্ক' হিসাবে সুবিদিত ছিল। বাবু
রাম, কামরাজ নাদার প্রমুখ পশ্চাদ্‌পদ জাতির মানুষ কংগ্রেস দলের প্রথম শ্রেণী
হিসাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তবে কংগ্রেস দল
জাতির ব্যাপক সমর্থনের বিস্তৃত ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান ছি
সামগ্রিক বিচারে কংগ্রেস দলের প্রকৃত কর্তৃত্ব উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের হাতেই ন্যস্ত ছিল
বিষয়টিকে কংগ্রেস দল যেভাবে ব্যবহার করেছে তার ফলে জাতিগত সচেতনতা বৃদ্ধি
এবং রাজনীতিতে দরকষাকষির জন্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে এবং অভিন্ন জাতির বিভিন্ন
মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এই পরিস্থিতির পরিব
জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীগুলি
ভাঙ্গন দেখা দেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একই জাতির বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে
জাতির বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সৃষ্টি হয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে
জাতিতে মৈত্রীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পায়।

রাজ্য-রাজনীতিতে জাতি // ভারতে রাজ্যস্তরের রাজনীতিতে এবং স্থানীয় স্তরের রা
জাতপাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সর্বভারতীয় স্তরে
রাজনীতিতে এই প্রভাব অনেক কম। মাইকেল ব্রিচার (Michael Brecher) তাঁর
sion in India শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের
কোন অঙ্গরাজ্যই রাজনীতিক ক্ষেত্রে জাতপাতের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এ বিষয়ে
অবকাশ নেই। তবে বিশেষ কয়েকটি রাজ্যের রাজনীতিতে জাতপাতের নিয়ন্ত্রণমূলক
পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পিছড়ে বর্গের মানুষকে নিয়ে রাজনীতি // ষাটের এবং সত্তরের দশকে উত্তর
অঙ্গরাজ্যগুলিতে পশ্চাদ্‌পদ জাতিসমূহে সংগঠিত করে তাদের জন্য অধিক সুযোগ
আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনীতিক দল এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ-আয়োজন
করে। এ ক্ষেত্রে রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এবং
চরণ সিং-এর নেতৃত্বাধীন লোকদলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৮ সালে
জনতা দলের শাসন কায়েম ছিল। এই সময় করপুরী ঠাকুরের সরকার সরকারী
অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ছাব্বিশ শতাংশ ... বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

করপুরী ঠাকুর নিজে ছিলেন একজন নাপিত জাতির মানুষ। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে রাজনীতি অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিষয়টি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর আমলে। ১৯৯০ সালে জনতা দলের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাতীয় রাজনীতির কর্মসূচীতে অকস্মাৎ এক মৌলিক পরিবর্তন ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর এই রাজনীতিক কৌশলকে ভারতীয় রাজনীতির মণ্ডলীকরণ হিসাবে অভিহিত করেন।। সমালোচকদের অভিমত অনুসারে মণ্ডল কমিশনের রাজনীতি ভারত ও ভারতবাসীর বৃহত্তর ও সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী।

বিহারের রাজনীতিতে জাতি // বিহার রাজ্যের রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীকে সামিল হতে দেখা যায়। এই জাতি গোষ্ঠীগুলি হল ব্রাহ্মণ, রাজপুত, যাদব ও আদিবাসী। জাতিগত স্বার্থ সাধন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে এই সমস্ত জাতিগোষ্ঠী সক্রিয় রাজনীতির সামিল হয়। এই জাতিগোষ্ঠীগুলি বিশেষ কোন রাজনীতিক দলের পিছনে সমর্থন যোগায় অথবা নিজেদের রাজনীতিক গোষ্ঠী গঠন করে। রামগড়ের রাজা কামাক্ষ্যা নারায়ণ সিং-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনতা পার্টিকে সাধারণত রাজপুতরা সমর্থন করে। যাদবদের সমর্থন পায় লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল। আইনসভায় ও মন্ত্রিসভায় পদপ্রাপ্তির ব্যাপারে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। বিহারের আদিবাসীরা নিজেদের পৃথক রাজনীতিক দল গঠন করেছে। এই দলটির নাম হল ঝাড়খণ্ড পার্টি। আদিবাসীরা পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি জানায়। এই দাবি এখন স্বীকৃতি পেয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে জাতি // অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য-রাজনীতিতে তিনটি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। এই তিনটি জাতি হল রেড্ডী, কাম্মা ও ভালামা। আগে অন্ধ্রপ্রদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর কাম্মা জাতির মানুষের প্রভাব ছিল সুবিদিত। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস রেড্ডীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। এই সময় কাম্মারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করে। কাম্মাদের আনুগত্য আদায়ের জন্য জাতীয় কংগ্রেস এস. কে. পাতিলকে নিযুক্ত করে। পাতিল কাম্মাদের নেতা এন. জি. রঙ্গের সমর্থন আদায়ে সফল হন। তারফলে ১৯৬৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস অন্ধ্রপ্রদেশে জাতপাতের রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের সঙ্গে মোকাবিলায় সক্ষম হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে জাতপাতের রাজনীতি আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এ প্রসঙ্গে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কথা উল্লেখযোগ্য। বিশেষ একটি জাতির মানুষ যদি বিশেষ একটি অঞ্চলের অধিবাসী হয়, তা হলে রাজনীতিতে জাতিগত প্রভাবের সঙ্গে আঞ্চলিকতার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে এম. এন. শ্রীনিবাস মন্তব্য করেছেন: "......the regional claims in Andhra are often only a disguise for caste claims." বস্তুত অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের রাজনীতিতে জাতপাতের প্রভাব অতিমাত্রায় অধিক।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জাতি // মহারাষ্ট্রের রাজ্য-রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ তিনটি জাতিগোষ্ঠীকে সামিল হতে দেখা যায়। এই তিনটি জাতি হল ব্রাহ্মণ, মারাঠা ও মাহার। সামাজিক স্তরবিন্যাসে মাহাররা হল নীচু জাতির মানুষ বা অস্পৃশ্য। কিন্তু রাজ্যের মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মাহারদের সংখ্যা হল প্রায় পঁচিশ শতাংশ। মহারাষ্ট্রের কোলাপুর ও সাতারা অঞ্চলে মাহারদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার গোড়ার দিকে এই বিশাল সংখ্যক মাহারদের রাজ্য-রাজনীতিতে তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য-রাজনীতিতে মাহারদের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে শুরু থেকেই সজাগ ছিল। স্বভাবতই

যাদব ও কুর্মিরা নির্বাচনী রাজনীতিতে যে যার জাতির প্রার্থীদের সমর্থন করে। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে জাতিগত বিচার-বিবেচনার গুরুত্ব বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। রাজ্যের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনীতিক দলগুলির নির্বাচনী এলাকার অধিবাসীদের জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

চার, ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিক দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একাধিক জাতিগত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তা ছাড়া আইনসভা, মন্ত্রিসভা এবং পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেও এ রকম জাতিগত গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী দেখা যায়। সাধারণত প্রাধান্যকারী জাতির ব্যক্তিবর্গই এই সমস্ত গোষ্ঠী গঠন করে। এক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের-নিম্নবর্ণের জাতিগত ধারণা কাজ করে না।

পাঁচ, অধিকাংশ রাজ্য-রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদের বিষয়টি একটি সাধারণ সত্য। অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে সংগঠিত হয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। রাজ্য-রাজনীতিতে একাধিক জাতিগোষ্ঠী মিলিত হয়ে এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হল রাজনীতিক দরকষাকষির মাধ্যমে আর্থনীতিক বা বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে এ রকম একটি সংগঠন হল 'আজগির' (AJGYR)। আহির, জাঠ, গুজ্জর, যাদব ও রাভা রাই জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে নিয়ে এই সংগঠনটির সৃষ্টি হয়েছে।

ছয়, রাজ্য-রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর এ ধরনের কোয়ালিশন গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সাধারণত সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের নেতৃস্থানীয় বাছাই করা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

রাজনীতিক সক্রিয়তা ও জাতিগত বিরোধ ।। অনেকের অভিমত অনুযায়ী বর্তমান ভারতের সকল রাজনীতিই হল জাতিগত রাজনীতি। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য সকল স্তরের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ কথা সাধারণভাবে সত্য। এই কারণে আধুনিক ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার সাম্প্রতিক চেহারা-চরিত্র সম্যকভাবে অনুধাবনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনীতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়টি আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে উপদলীয় চক্র, দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা প্রভৃতি বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থার সক্রিয়তার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য জাতিগত স্বার্থের চেতনা, পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে বিচার-বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে তিনটি জাতির মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাৎপর্যপূর্ণ। এই তিনটি জাতি হল—রেড্ডী, কামা ও ভেলামা। অন্ধ্রের এই তিনটি জাতির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করলে অন্ধ্রের রাজনীতি সম্যকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। রাজ্য-রাজনীতিতে জাতিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি পর্যালোচনার প্রয়োজনে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যেও এ ধরনের কিছু জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উত্তরপ্রদেশে জাঠ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, বিহারে রাজপুত, ভূমিহার ও কায়স্থদের মধ্যে বিরোধ, গুজরাটে পাতিদার ও বানিয়াদের মধ্যে বিরোধ, মহারাষ্ট্রে মাহার ও মারাঠা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ, কর্ণাটকে ওক্কালিঙ্গা ও লিঙ্গায়েতদের মধ্যে বিরোধ, কেরালায় নায়ার ও ইজহাভাসদের মধ্যে বিরোধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে সনাতন ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণের মত এক-একটি উচ্চবর্ণের জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এবং প্রাধান্যকারী এই সমস্ত জাতির কর্তৃত্বমূলক অবস্থান ছিল সুরক্ষিত। কালক্রমে প্রাধান্যকারী এই জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চবর্ণের মানুষ অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করে। এইভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসে তথাকথিত নীচু জাতের মানুষ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করে। এবং কালক্রমে নিজেদের

স্বার্থে রাজনীতিক দলগুলি তৎপর হয়। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাক্কালে দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন ... মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কালে দপ্তর বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনীতিক দলগুলি জাতিগত বি... বিবেচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

জাতিগত সচেতনতা বৃদ্ধি ।। ভারতের সংবিধানে জাতিভেদহীন সমাজব্যবস্থার কথা ... হয়েছে। আবার সংবিধানেই তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে কার্যত জাতির ধারণাকে স্বীকার করা হয়েছে। তপসিলী জাতি ... উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ভারতের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী... সমূহের মধ্যে জাতিগত সচেতনতাকে অধিকতর উজ্জীবিত করে। আবার তথাকথিত অনগ্রসর ... জাতিসমূহের স্বার্থে সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগ-আয়োজন ভারতের জনসমাজকে বহুধাবিভক্ত করেছে। এই সমস্ত সংরক্ষণমূলক সরকারী ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে সামাজিক বিক্ষোভ-বিদ্রোহ এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কর্ণাটক প্রভৃতি দক্ষিণী রাজ্যসমূহে সংঘটিত সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়।

তা ছাড়া ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। প্রতিনিধি নির্বাচন ও সরকারী ক্ষমতা দখলের এই পন্থা-পদ্ধতিতে সংখ্যা হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংখ্যাধিক্যের শক্তির ভিত্তিতে ভারতের বৃহৎ জাতিগুলি আইনসভায়, মন্ত্রিসভায় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্তৃত্ব কায়েম করার সুযোগ পায় এবং এই সুযোগ তৎপরতার সঙ্গে ব্যবহার করে। তাই ভারতের জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে জাতিগত সচেতনতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়।

জাতি এবং রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বসহকারে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এই দুটি বিষয় হল : এক, বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন এবং দুই, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জাতি কিভাবে প্রবেশের সুযোগ পায় তা অনুধাবন।

এক, জাতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির পরিবর্তন ।। স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা কাঠামোর গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এবং এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারমূলক আইনী ব্যবস্থা, সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা—এই বিবিধ সাংবিধানিক বা আইনমূলক ব্যবস্থার ইতিবাচক অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা লাভের উত্তরপর্বে ভারতের ক্ষমতা কাঠামোতে ক্ষমতার নতুন ... আধার হিসাবে রাজনীতিক দল, পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এই সমস্ত ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগেকার ... জাতিগোষ্ঠীসমূহের প্রধানদের হাতে যে ক্ষমতা ছিল তা নতুন এই সমস্ত ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে এসেছে। পৃথকীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর জাতিগত ক্ষমতার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। এবং এই পরিবর্তন সূত্রে জাতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের একটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই ... প্রাধান্যকারী জাতিগোষ্ঠীর হাত থেকে ক্ষমতা অন্য একটি জাতিগোষ্ঠীর হাতে গেছে অর্থাৎ জাতিগত উর্ধ্বাধঃ স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চস্তরের জাতিগোষ্ঠীর হাত থেকে নিম্নস্তরের জাতিগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। এবং এই সমস্ত নিম্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সংখ্যার বিচারে বেশী। সংখ্যার আধিক্যের কারণে এই সমস্ত জাতির মানুষের প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতাও বেশী। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্ত নীচু জাতির মানুষ সাবেকি ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করেছে এবং নিজেদের দাবি-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত বা বাস্তবায়িত করেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ...

ব্যবস্থায় এ রকম অবহেলিত জাতিগোষ্ঠীসমূহের অভ্যুত্থানের কথা বলেন। আবার স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরের পর্বে উত্তর ভারতের বেশ কিছু রাজ্যে সম্পন্ন কৃষিজীবী জাতিসমূহ রাজনীতিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। তবে সাম্প্রতিককালে রাজনীতিক তথা সরকারী উদ্যোগে বেশ কিছু পশ্চাদ্‌পদ জাতিকে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী' (O.B.C.—Other Backward Classes) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এরাও রাজনীতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের জাতিগুলিকে কঠোর চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দুই, গণতন্ত্রে জাতিগোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধি ।। গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতিগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিক কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। গণতন্ত্রের গণ-ভিত্তিক সমাজে সরকারী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসে। এ রকম পরিস্থিতিতে জাতিগোষ্ঠীসমূহের সক্রিয়তা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতের বিগত পাঁচ দশকের ইতিহাসে জাতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষমতার পরিধিতে প্রবেশের অধিকার ও সুযোগ থেকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সুদীর্ঘকাল যাবত বঞ্চিত ছিল। সমাজের এই বঞ্চিত অংশটি গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ব্যবস্থার সুবাদে রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করছে। এ ঘটনা গ্রামীণ পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি পর্যন্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের থেকে জাতিগত পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় নির্বাচকের নাগরিক সত্তার থেকে জাতিগত সত্তাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের জাতি-ভিত্তিক পরিচয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং জাতিগত সচেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিগোষ্ঠীগুলি সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনীতিক দরকষাকষির সামিল হচ্ছে। দেশের রাজনীতিক দলগুলিও নির্বাচনী সাফল্যকে নিরাপদ করার জন্য জাতিগোষ্ঠীগুলির এজাতীয় উদ্যোগকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। জাতিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতে জাতিগোষ্ঠীসমূহ সংগঠিতভাবে রাজনীতিক কর্মসূচীর সামিল হচ্ছে। এবং এই পথে জাতিসমূহ সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে।

গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিক ব্যবস্থা ।। আবার বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে একটি জাতি অন্যান্য জাতির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের কথা বলা যায়। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার আধিক্য বর্তমান। এই কারণে সরকারী চাকরি-বাকরিতে এই ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি অতিমাত্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। তার ফলে জাতিগত বিচার-বিবেচনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিক ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ রকম পরিস্থিতিতে রাজনীতিক শক্তি সংগ্রহ এবং রাজনীতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার স্বার্থে সমাজের সকল রকম আনুগত্যের সুযোগ গ্রহণের জন্য উদ্যোগ-আয়োজন বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বা রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভিন্ন সাংগঠনিক সমর্থনও অপরিহার্য প্রতিপন্ন হয়। স্বভাবতই জাতিগত আনুগত্য এবং জাতিভিত্তিক সংগঠনের রাজনীতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি ও জাতির সংযোগ নিবিড় ।। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। তাই ভারতে রাজনীতি ও জাতিব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক নিকট ও নিবিড়। দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও জাতিব্যবস্থার মধ্যে গভীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এবং এই মিথস্ক্রিয়া (interaction)-র ফলে রাজনীতি ও জাতিব্যবস্থার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। রাজনীতিক স্বার্থে জাতিভিত্তিক সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হয়। রাজনীতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসমূহও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়।

জাতির ধারণা ।। ... এক বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়। এই সামাজিক ... নয়। ভারতীয় সমাজে জাতি বলতে এক বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী ... জন্মগত বিচারে নির্ধারিত হয়। এই সামাজিক গোষ্ঠী হল একটি স্থানীয় গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা কোন বহির্গোষ্ঠীর সদস্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না। সনাতন ভারতে জাতিগোষ্ঠীগুলির সুনির্দিষ্ট বৃত্তিগত বিন্যাস ছিল। বংশগত ধারার ভিত্তিতে একটি জাতির সঙ্গে আর একটি জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে জাতিগত ... বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয়। এর ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ... দূরত্ব দেখা দেয়। আবার একটি জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণত উপ-জাতি (sub-caste) ... বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। এ রকম প্রতিটি উপ-জাতি (sub-caste)-র সদস্যরা নিজেদের ... অধিকতর ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা সংরক্ষণে সতর্ক থাকে। সমগোষ্ঠীর সঙ্গে তারা সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারতের সামাজিক কাঠামোতে জাতিসমূহের উর্ধ্বাধঃ বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক জাতিরই সাধারণত ... এবং মোটামুটি স্বতন্ত্র কিছু আচার-অনুষ্ঠান থাকে। এই সমস্ত জাতিগত আচার-অনুষ্ঠান ছুৎ-অচ্ছুৎ ধারণার সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। তদনুসারে জাতিসমূহের সামাজিক উর্ধ্বাধঃ ... নির্ধারিত হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাস ছুৎ-অচ্ছুৎ ধারণার ভিত্তিতে একটি বিশেষ জাতিকে ... অন্যান্য জাতির থেকে নীচু এবং নিম্নস্থ অন্যান্য জাতির থেকে উঁচু জ্ঞান করা হয়। ... বের্তে তাঁর *Society and Politics in India* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Ca... are hierarchically ranked groups or categories based on heredit... membership which maintain their social identity by strict rules of ... dogamy." এ রকম এক-একটি জাতিগোষ্ঠী সাধারণত বৃহৎ একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ... ছড়িয়ে থাকে। আবার কোন অভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অ... বিচ্ছিন্নভাবেও বসবাস করতে দেখা যায়। ভারতীয় সমাজে জাতির উদাহরণ হিসাবে রাজ... রেড্ডী, কুর্মি, কাম্মা, ওক্কালিঙ্গা প্রভৃতির কথা বলা যায়।

জাতির কাঠামোগত দিক এবং রাজনীতির গুরুত্ব ।। সামাজিক কাঠামোতে জাতিসমূ... উর্ধ্বাধঃ বিন্যাস কেবলমাত্র ছুৎ-অচ্ছুৎ ধারণার দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এ ধারণা ... নয়। ক্ষমতার অসম বণ্টনের বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তমূলক গুরুত্বসম্পন্ন। মতাদর্শ ... মূল্যবোধের বিচারে জাতিব্যবস্থা হল একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। এ কথা ঠিক। আবার জাতিব্য... হল একটি কাঠামোগত ব্যবস্থা। জাতিব্যবস্থার এই কাঠামোগত দিকটির সঙ্গে সংযুক্ত বিষয় ... হল প্রভুত্ব ও বশ্যতা, উদ্বৃত্ত ও শোষণ, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও বঞ্চনা প্রভৃতি। জাতিব্যবস্থার ... এই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যটির পরিপ্রেক্ষিতে জাতির কাছে রাজনীতির এবং রাজনীতিতে জাতির ... ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়।

ভারতের সামাজিক কাঠামো বহুলাংশে জাতিপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে পশ্চিমী ... আধুনিকীকরণের প্রভাবে জাতিগত বাঁধনের কঠোরতা হ্রাস পেতে শুরু করে। বিদেশী ব্রিটিশ ... সরকারের উদ্যোগে ভারতে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। তার ফলে ... দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। রেলগাড়ীতে যাত্রী পরিবহণ ... ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতিভেদজনিত বৈষম্যের অবসান করা হয়। তারফলে ভারতীয় জনজীবনের ... উপর জাতি-ভেদ প্রথার নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু উপনিবেশিক ব্রিটিশ ... সরকারই কালক্রমে অনুধাবন করে যে এ দেশের একটি জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে ... লাগান সম্ভব। এই উপলব্ধি সূত্রেই ব্রিটিশ সরকার 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) ... এই নীতি গ্রহণ করে এবং কাজ হাসিলের জন্য জাতিগত বিরোধকে উস্‌কে দেয়।

২৭.৪ ভারতীয় রাজনীতিতে জাতির ভূমিকা (Role of Caste in Indian Politics)

রাজনীতিতে জাতি প্রথার প্রভাব প্রসারিত হয়েছে ।। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতি ও ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুবিদিত। দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিক ব্যবস্থার উপর জাতি-ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা এবং এমনকি লোকসভা নির্বাচনেও জাতিপ্রথার প্রভাব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। বস্তুত পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থাই রাজনীতিতে জাতি ব্যবস্থার ভূমিকাকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের দ্বারা মনোনীত ও সমর্থিত হন। কিন্তু আসলে তাঁরা স্ব স্ব জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তদনুসারে নির্বাচনী সমর্থনও লাভ করেন। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার উপর জাতিপ্রথার প্রভাব সারা দেশব্যাপী পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভাব কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জাতিগত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে স্পষ্ট। তবে দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে এই প্রভাব অতিমাত্রায় প্রবল ও প্রকট। বর্তমান ভারতের রাজনীতিক পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া সক্রিয়। এই পরিবর্তনের পরিমণ্ডলের মধ্যে সনাতন ভারতের জাতি-ব্যবস্থা নতুন মাত্রা ও গুরুত্ব লাভ করেছে। স্থানীয় জাতিগুলি জাতিভিত্তিক সঙ্ঘের সামিল হয়েছে, জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হয়েছে, আঞ্চলিক রাজনীতিক দলে যোগ দিয়েছে প্রভৃতি। তার ফলে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠী সদস্য হয়েছে, আঞ্চলিক রাজনীতিক দলে যোগ দিয়েছে প্রভৃতি। তার ফলে স্থানীয় জাতিগুলির গুরুত্ব ও মাত্রার পরিধি প্রসারিত হয়েছে। সিক্রী (S. L. Sikri) তাঁর *'Indian Government and Politics'* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Indeed, within the framework of modernization and political change, caste has taken on new dimensions and has also acquired a new emphasis."

সংবিধান ও জাতি ।। সনাতন ভারতের জাতিভেদ প্রথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের বিবিধ ক্ষতি সাধন করেছে। এই কারণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতিভেদ প্রথার অবসানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের সংবিধান ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধানে অস্পৃশ্যতামূলক সকল রকম আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে বিশেষ কিছু জাতি ও শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে যত দ্রুত সম্ভব উন্নত করে জাতির মূল জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণমূলক এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই সমস্ত পশ্চাদপদ শ্রেণীসমূহের রাজনীতিক সমর্থন হারানর আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ক্ষমতাসীন সকল রাজনীতিক দলই এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মেয়াদকে বারে বারে বাড়িয়ে গেছে। নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্যের স্বার্থে বিশাল সংখ্যক এই সমস্ত মানুষের সমর্থন অপরিহার্য বিবেচিত হয়। এই কারণে ভারতের সমাজব্যবস্থার মত রাজনীতিক ব্যবস্থার গভীরে জাতিপ্রথা প্রবেশ করেছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করে ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ রাজনীতিক দলগুলি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল হয়। তপসিলী জাতি, তপসিলী উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ উপজাতিগুলি সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত। এই জাতিগোষ্ঠীগুলিও দেশের সংসদীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ও শক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়। নির্বাচনে এই জাতি-গোষ্ঠীগুলির ভোট পেয়ে ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যের